

করোনার আদ্যোপাত্ত: সর্বশেষ গবেষণার আলোকে

ড. সেলিম মুহাম্মদ খান

করোনা মহামারী বৈশ্বিক রূপ ধারণ করে সারা দুনিয়াকে ছেয়ে ফেলেছে। রোগটির বিস্তার দাবানলের মতো পৃথিবীর ২১০টি দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। এ প্রবন্ধ লেখা পর্যন্ত প্রায় ৯২ লাখের বেশি লোক এ ভাইরাসে আক্রান্ত ও ৪ লাখ ৭৫ হাজারের অধিক মৃত্যু হয়েছে। মনে হচ্ছে করোনা আজকাল মৃত্যুর এক হোলি খেলায় মেতে উঠেছে। এর শেষ কোথায় গিয়ে ঠেকবে তা সঠিক করে কোন কম্পিউটার মডেলও বলতে পারছে না।

এ প্রবন্ধে সর্বশেষ বৈজ্ঞানিক গবেষণার আলোকে কিছু নির্ভরযোগ্য তথ্য এবং করোনা প্রতিরোধে আমাদের করণীয় বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রসংগ তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

শুরুর কথা:

করোনা একটি ভাইরাস জনিত রোগ। গত বছর ২০১৯ সালের ১৭ নভেম্বর চীনের উহান শহরে এই ভাইরাসে আক্রান্ত প্রথম রোগী সনাক্ত হয়। ৩১শে ডিসেম্বর চীন থেকে এ রোগের প্রাথমিক রিপোর্টটি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও সংবাদ মাধ্যমে আসে। ২০২০ সালের ২২ জানুয়ারি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু ঘটে উহান শহরে। একটি সম্পূর্ণ নতুন প্রজাতিশ্রেণীর ভাইরাস এ রোগের জন্য দায়ী যাকে প্রথমে SARS COV-2 এবং পরে নভেল করোনা ভাইরাস -nCoV-19 নাম দেওয়া হয়। ৩০শে জানুয়ারী বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এটিকে বিশ্ব জনস্বাস্থ্যের জন্য এক জরুরী উদ্বেগ (Public Health Emergency of International Concern) বলে ঘোষণা দেন এবং এ রোগের অফিশিয়াল নাম প্রদান করে COVID-19। বিশ্বব্যাপী এর দ্রুত বিস্তারের প্রেক্ষিতে ১১ই মার্চ ২০২০ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা একে বৈশ্বিক মহামারী (pandemic) হিসেবে ঘোষণা দেয়।

ভাইরাস রহস্য:

করোনা ভাইরাসের বিষয়ে বিস্তারিত জানার আগে চলুন ভাইরাস সম্পর্কে মৌলিক কিছু তথ্য জেনে নেয়া যাক। ভাইরাস শব্দটি ল্যাটিন থেকে এসেছে যার ইংরেজী হলো পয়জন এবং বাংলায় বিষ। ভাইরাস অতি ক্ষুদ্র এক অনুজীব যা খালি চোখে তো দূরের কথা, সাধারণ অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েও দেখা যায় না। ভাইরাস দেখতে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের প্রয়োজন হয়। আমাদের এ পৃথিবীর সর্বত্র ভাইরাসের বিচরণ রয়েছে: মাটিতে, পানিতে, বাতাসে এমনকি সাগরের নোনা পানিতেও অসংখ্য ভাইরাসের অনুকনা ছড়িয়ে রয়েছে। এককোষী এ অতি ক্ষুদ্র ভাইরাস নিজীববস্তু ও জীবের মাঝামাঝি একটা পর্যায়ে অবস্থান করে যা কেবল জীবদেহে প্রবেশের পরই নিজস্ব প্রাণ পায় ও বংশ বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়। খোলা চোখে অদেখা এ ভাইরাসগুলো সংখ্যায় এতো অগুণিত যে এদের একটার পর একটা সারিবদ্ধ করলে পৃথিবী থেকে ২০০

আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত যে গ্রহ- K2-155d বা 'সুপার আর্থ' রয়েছে সেখান পর্যন্ত তা বিস্তৃত হবে। সুতরাং জানা গেল যে, ভাইরাসকে বেঁচে থাকতে অন্য কোন প্রাণীর কোষের ভেতরে ঢুকে নিজের বংশ বৃদ্ধির জারী রাখতে হয়, তা না হলে সে মৃত অবস্থায় একটা সময় পর্যন্ত পড়ে থাকবে এবং অবশেষে এমনিতেই মারা যাবে। প্রকারভেদে ভাইরাস কেবল মানুষকে নয়, আর সকল প্রাণী, গাছপালা, এমনকি অন্যান্য অনুজীব যেমন ব্যাকটেরিয়াকেও আক্রমণ করতে পারে।

ভাইরাসের ইতিহাস:

১৮৯২ সালে একজন রাশান উদ্ভিদবিদ দিমিত্রি ইভানোভস্কি লক্ষ্য করেন যে ব্যাকটেরিয়ার মতো একটি অনুজীব তামাক পাতাকে খেয়ে ফেলছে। তার এই আবিষ্কারের মাধ্যমে আমরা প্রথম জানতে পারি যে ভাইরাস নামের এক ভিন্ন অনুজীব আছে, যা ব্যাকটেরিয়া নয়। ১৮৯৮ সালে ফরাসী জীববিজ্ঞানী মার্টিনস বাইজেরনিক এ অনুজীবটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ ভাইরাস হিসেবে বর্ণনা করেন যা বহুল আলোচিত টোবাকো মোজাইক ভাইরাস নামে সমধিক পরিচিত। ১৯০১ সালে মানুষের দেহে প্রথম ভাইরাস সনাক্ত করেন ওয়াল্টার রিড, যার নাম দেয়া হয় “ইয়েলো ফিভার ভাইরাস”। ভাইরাসের গড়নে থাকে (১) একটি জিনেটিক উপাদান, ডিএনএ (DNA) বা আরএনএ (RNA)-র একটা লম্বা চেইন, যার ভেতরে একটি প্রোটিনের কীলক প্রবিষ্ট থাকে (২) জেনেটিক বস্তুটিকে ঢেকে রাখা একটি প্রোটিনের আবরণ (capsid) (৩) এক বা দুই পাটার ফ্যাট বা লিপিডের আবরণ। ভাইরাস কিভাবে পৃথিবীতে এলো তা নিয়ে জীববিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ আছে। কেউ বলে ব্যাকটেরিয়া থেকে এর জন্ম, কেউ বলে প্লাজমিডস নামক কোষ থেকে কোষে চলাচলকারী ডিএনএ থেকে এর উদ্ভব। বিবর্তন প্রক্রিয়ায় ভাইরাস এক অভ্যাসচর্য ভূমিকা পালন করে। আমরা যাকে বলি জিনেটিক ডাইভারসিটি বা জীনবৈচিত্র্য তা বিভিন্ন ধাপে জীনের রূপান্তর ঘটিয়ে জীববৈচিত্র্য নির্ধারণ করে।

করোনা ভাইরাস কি?

ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখলে এই ভাইরাসকে মাথার মুকুটের মতো দেখা যায়। ল্যাটিন ভাষায় 'করোনাম (Coronam) এর ইংরেজী হল crown যার বাংলা হল মুকুট। মুকুটে বিদ্রূপ কাটার মতো যে বস্তুগুলো দেখা যায় সেগুলি হলো ভাইরাসের দেয়ালে প্রোথিত স্পাইকোপ্রোটিন (spike glycoproteins)। এদের মূল কাজ হল মানুষের শরীরে গ্রহীতা প্রোটিনের (receptor protein) গায়ে গেথে কোষের ভেতর ঢুকা। প্রকৃতিতে হাজারে রকমের করোনা ভাইরাস বিদ্যমান যা সাধারণত অন্যান্য প্রাণীতে রোগের সৃষ্টি করে যেমন, বাদুড়, বানর, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি। কিন্তু এইসব প্রাণী থেকে যখন প্রজাতির দেয়াল ডিঙ্গিয়ে (spill over) মানুষের মধ্যে চলে আসে এবং রোগের সৃষ্টি করে তাকে বলা হয় 'জুনোসিস' বা প্রাণীঘটিত রোগ।

করোনা ভাইরাসের ইতিহাস

করোনা ভাইরাস প্রথম ১৯৩০ অর দশকে গৃহপালিত মুরগীর বাচ্চার শরীরে সনাক্ত হয় যেগুলো হাঁফানো ও তন্দ্রাচ্ছন্নতার উপসর্গ প্রকাশ করে। পরের বছর আর্থার সাল্ক ও এম সি হক নর্থ ডেকোটার মুরগীর বাচ্চার শ্বাস তন্ত্রের সংক্রামক ভাইরাসরূপে এটিকে বর্ণনা করেন। মানবদেহে করোনা ভাইরাস আবিষ্কৃত হয় ১৯৬০ সালে যখন দুটি ভিন্ন উপায়ে যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রে ভাইরাসটিকে সনাক্ত করা হয়। ১৯৬৭ সালে স্কটিশ ভাইরোলজিস্ট জুন আলমেইডা লন্ডনের সেন্ট থমাস হাসপাতালে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের মাধ্যমে করোনা ভাইরাসের মুকুটের মতো চিত্র তৈরী করেন যা এই অদৃশ্য ভাইরাসকে আজ আমাদের নিকট দৃশ্যমান করেছে।

করোনার রকমফের:

আজ পর্যন্ত মাত্র সাতটি করোনা ভাইরাস মানুষের মধ্যে রোগের সৃষ্টি করেছে। ১৯৬০-এর দশক থেকে মানুষের মধ্যে সংক্রমিত ভাইরাসের শ্রেণীবিন্যাস শুরু হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেন যে, সাত ধরনের করোনা ভাইরাসের মধ্যে প্রথম চারটি সাধারণত মৃদু বা কম মারাত্মক; বাকি তিনটা মারাত্মক রোগের রোগের সৃষ্টি করে, যার মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক প্রতীয়মান হচ্ছে বর্তমানে বৈশ্বিক মহামারী 'কোভিড-১৯ সৃষ্টিকারী নতুন ভাইরাস-Novel SARS-COV-2।

আমাদের আলোচ্য করোনা পরিবারে চার প্রকার ভাইরাস রয়েছে: ১) আলফা করোনা ২) বিটা করোনা ৩) গামা করোনা ৪) ডেলটা করোনা। এই ভাইরাস গুলি মানুষ এবং বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে পাওয়া যায়। সবচেয়ে ক্ষতিকারক বিটা করোনা ভাইরাসের আবার কয়েকটি প্রজাতি আবিষ্কৃত হয়েছে:

১) SARS COV –এর সংক্রমণ হংকং থেকে শুরু হয়ে ২০০৩ সালে প্রথমে এশিয়ায় এই ভাইরাস মহামারীর আকার ধারণ করেছিল। পরে তা ইউরোপে সহ উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়ে এবং সে মহামারীতে ৮শর মতো মানুষ প্রাণ হারিয়েছিলেন। তবে ২০০৪ সালের পর এই ভাইরাসে আর কেউ আক্রান্ত হওয়ার রিপোর্ট আসেনি।

২) HCoV NL63: ২০০৪ সালে নেদারল্যান্ডসে সাত মাসের এক বাচ্চার দেহে সনাক্ত হয় যার ব্রনকিওলাইটিসের উপসর্গ দেখা দেয়। আমস্টারডামে চালানো এক গবেষণা অনুযায়ী এটি ৪.৭% সাধারণ শ্বাসতন্ত্রের রোগের জন্য দায়ী।

৩) HKU1: ২০০৫ সালে প্রথমে হংকং এ ৭১ বছর বয়স্ক এক ব্যক্তির দেহে সনাক্ত হয়। এটি উপরের শ্বাসতন্ত্রের রোগসহ নিউমোনিয়া ও ব্রনকিওলাইটিসের জন্য দায়ী।

৪) MERS-CoV - ২০১২ সালে মধ্যপ্রাচ্যে বিশেষ করে সৌদি আরব থেকে প্রথমবার এই ভাইরাসের সংক্রমণ শুরু হয়। যারা এই ভাইরাসে আক্রান্তদের সংস্পর্শ থেকে তা অন্যত্র ছাড়তে থাকে; তে তা বড় কোন মহামারীর জন্ম দেয়নি।

৫) SARS COV-2- ২০১৯ সালের ১৭ নভেম্বর চীনের উহান শহরে এই ভাইরাসে আক্রান্ত প্রথম রোগী সনাক্ত হয়। এটি করোনা ভাইরাস নামে পরিচিত। করোনার CO, ভাইরাসের VI এবং ডিজিসের D নিয়ে হয়েছে COVID-19। ২০১৯ সালে ভাইরাসটি প্রথম ধরা পড়ায় 19।

করোনার গঠন:

এই নভেল করোনা ভাইরাসটি একটি দুইপাটার (bilateral)RNA আবরণে ঢাকা ভাইরাস। ধারণা করা হচ্ছে এই ভাইরাসটি বাদুরের দেহ থেকে প্যাঙ্গোলিন নামক একটি পিঁপড়া থেকে প্রাণীর মাধ্যমে মানুষের দেহে সংক্রমিত হয়েছে। ভাইরাসটি চোখ, নাক-মুখ- দিয়ে মানুষের দেহে প্রবেশ করে।প্রাথমিকভাবে গলগহবরে অবস্থান ও বংশবৃদ্ধি করে এবং কয়েকদিনের মধ্যে শ্বাসনালীর বা শ্বাসযন্ত্রের যে কোষগুলোতে ACE-2 (Angiotensin Converting Enzyme 2) Receptor থাকে শুধু ঐ কোষগুলোতে প্রবেশ করে। এযাবৎ করা গবেষণা হতে জানা যায় যে, মশার কামড়ে, রক্তের মাধ্যমে বা গর্ভকালীন সময়ে মা থেকে নবজাতকের মধ্যে এই ভাইরাস ছড়ায় না।

করোনা রোগেপ্রবাহ ও লক্ষণ:

সুপ্তিকাল (Incubation Period): দেহে প্রবেশ করার পর থেকে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার সময়টাকে সুপ্তিকাল বলে। করোনা ভাইরাসের ক্ষেত্রে এ সময়টা ১-১৪ দিন; তবে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে ৫ দিনের মধ্যেই লক্ষণ দেখা যায়। অন্যদিকে সাধারণ ক্লুতে ১-৩ দিনেই লক্ষণ প্রকাশ পায়। দীর্ঘ সুপ্তিকাল করোনাকে অধিক ছড়ানোর ক্ষমতা দিয়েছে। এটা সাধারণ রূপ থেকে আড়াইভাগ অধিক ছোয়াছে।ক্লুর তুলনায় ১০ ভাগ অধিক হাসপাতালের ভর্তি হতে হয় এবং মৃত্যুহার বয়সভেদে শতকরা ২ থেকে ২০ ভাগ।

এই ভাইরাস মানব দেহে প্রবেশ করার পর রোগটি তিনভাবে প্রকাশ পেতে পারে-

১) কোন উপসর্গ দেখা যাবেনা Sub-clinical infection

২) প্রথমদিন: অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ ও গায়ে ব্যাথা; কারো কারো স্বল্পমাত্রায় জ্বর ও শুকনা কাশি দিয়ে শুরু হতে পারে; কারো বা ঠান্ডাসহ কাপুনি, ঘাম ও কয়েক মিনিটের জন্য ৩৮ডিগ্রির বেশীও জ্বর হতে পারে;

৩) দ্বিতীয় দিনে ৩৮ ডিগ্রির উপরে জ্বর, গলা ব্যাথা থাকতে পারে;

৪) তিন-চার দিনের মাথায় হালকা জ্বর, সাথে কাশি ও গলা ব্যাথা হয়;

৫) ৫ম দিনে মাথা ব্যাথা হয়, পেটের অসুখও থাকতে পারে;

৬) ষষ্ঠ দিনে শরীর ব্যাথা বাড়ে, মাথা ব্যাথা কমে; তবে পেটের সমস্যা থাকতে পারে ও পাতাল পায়খানা হতে পারে

৭) ৭/৮ম দিনে হয় সব লক্ষণ আস্তে আস্তে চলে যেতে থাকবে অথবা যাদের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা দুর্বল বা কোন জটিল অসুখ আছে, তাদের ক্ষেত্রে এক সপ্তাহের মাথায় বেশি মাত্রায় স্বর-কাশি এবং সাথে শ্বাসকষ্ট, বুক চাপ ও ব্যাথা (ফুসফুসের প্রদাহ বা নিউমোনিয়া) হয়। এ অবস্থায় ৫% রোগীর রক্তবমিও হতে পারে।

৬) যদিও করোনা ভাইরাসজনিত ফুসফুসের ক্ষতির কথা সবাই জানে, জন হপকিন্স ৭ এপ্রিল জানাচ্ছে যে অনেক রোগীর হৃদযন্ত্রের সমস্যা হয়েছে এবং তারা কার্ডিয়াক এরেস্টে মারা গেছে

৭) কানাডার পিটসবার্গনিউরোলজিস্টরা করোনা রোগীর স্বাদ ও ঘ্রাণশক্তি হ্রাস পাওয়া, মতিভ্রংশতা (disorientation), এমনকি খিঁচুনিও লক্ষ্য করেছেন।

৮) সর্বশেষ গবেষণায় ভাইরাসটি জেনেটিক গঠন বদলিয়েছে এর ফলে তরুণদের মাঝে কিছু নতুন উপসর্গ তৈরী করছে যেমন স্ট্রোক সহ অনেকগুলো অর্গান সিস্টেম ফেইলিওরের খবর পাওয়া গেছে। পেনশিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সংক্রামক ব্যাধি বিভাগের প্রধান Dr. Ebbing Lautenbach করোনা রোগীর পায়ের পাতায় বা হাতের আঙুলে স্বকে নীলাভ লাল বা রক্তবেগুনি ক্ষত বা ফুসকুড়ির লক্ষ্য করেন এবং তা কোভিড-আনগুল (COVID toes) বলে বর্ণনা করেন।

করোনা ভাইরাস কিভাবে ছড়ায়?

করোনা ভাইরাস আমাদের হাচি, কাশি ও জিহ্বার লাল, নাকের সর্দির মাধ্যমে বিভিন্ন ভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

ক) সরাসরি: ইনকুয়েঞ্জা ভাইরাসের মতো করোনা ভাইরাসও সরাসরি না ঢেকে হাঁচি বা কাশি থেকে ড্রপলেট ক্ষুদ্র অনুদানার মাধ্যমে একজন থেকে অন্যজনের মধ্যে ছড়ায়।

খ) হাতের মাধ্যমে: আক্রান্ত রোগীদের কেউ যদি হাঁচি বা কাশি হাত দিয়ে ঢেকে দেয় তবে সেই হাতে লাগা ভাইরাস অন্য কারো সাথে হাত মিলালে সেই ভাইরাসযুক্ত হাতের মাধ্যমে ভাইরাস চলে আসতে পারে চোখে, নাক বা গলায় চলে আসে।

গ) অন্যান্য বস্তুর মাধ্যমে: বাহ্যত সূক্ষ্ম ভাইরাস বহনকারী বা আক্রান্ত রোগী যে কোন কোন বস্তু দরজার বা যানবাহনের হাতল, বা যে কোন কিছু স্পর্শ করলে সেখান থেকে অন্য সূক্ষ্ম ব্যক্তির হাত ভাইরাসের সংস্পর্শে আসতে পারে, উপাদান

ভেদে ধাতব, কাঠ,প্লাস্টিকের উপতলে করোনা ভাইরাস ১-৩ দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকে।বাতাসে তিন ঘন্টা পর্যন্ত ভেসে বেড়াতে পারে।

এখন পর্যন্ত অক্ষত স্বকের মাধ্যমে সরাসরি ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার প্রমাণ মিলেনি। ভাইরাসটি কেবল চোখ, নাক ও মুখের মিউকাস বা অন্তরাবরনের সংস্পর্শে এলেই তা দেহকোষের ভেতর ঢুকে গিয়ে বংশবৃদ্ধি করা শুরু করতে পারে। যদিও আক্রমণের তীব্রতা নির্ভর করে ব্যক্তির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, বয়স, লিঙ্গ, সার্বিক স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও জাতিগত পার্থক্যের উপর যা নীচে আলোচনা করা হলো।

বয়স, লিঙ্গ, স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও জাতিগত পার্থক্য (Differences in age, gender, environment and ethnicity):

করোনা সকল বয়সের (১-১০০+) মানুষকে আক্রান্ত করেছে।যদিও অল্প বয়সী শিশুরাও আক্রান্ত হয়েছে এবং তাদের মধ্যে মৃত্যুও ঘটেছে।কিন্তু এক্ষেত্রে তাদের শরীরে অন্য কোন ইমিউন বা রোগ প্রতিরোধজনিত অসুখ বা বৈকল্য ছিল কিনা। সাধারণভাবে সবাই আক্রান্ত হলেও ৫০ উর্ধ্বদের অধিক উপসর্গ দেখা দেয়।এযাবৎ প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে পুরুষরা মহিলাদের চেয়ে বেশী আক্রান্ত হচ্ছেন। যারা ধূমপায়ী, মদ্যপায়ী এবং এক দ্বারা যারা নিজেদের ফুসফুসকে প্রদাহযুক্ত ও রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে দুর্বল করে ফেলেছেন, যারা ইতোমধ্যে শ্বাসতন্ত্রের বা ফুসফুসের, হৃদরোগ, কিডনিরোগ, উচ্চ রক্তচাপের বা অন্যকোন সিস্টেমের রোগে আক্রান্ত, যারা স্বাস্থ্যগতভাবে দুর্বল, যেমন বৃদ্ধ বা যারা অন্য কোন রোগে আক্রান্ত করোনা ভাইরাসের আক্রমণ তাদের জন্য ভয়াবহ হয়। কোনো কোনো ভাইরাস যেমন HIV, ভাইরাল হেপাটাইটিস ও HPV সংক্রমণ আমাদের দেহের প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে পরাস্ত করে দেয়, এখন পর্যন্ত এই নতুন করোনা ভাইরাসের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি এখনও প্রতিষ্ঠিত। কোন কোন দেশে মৃত্যুহার বেশি হওয়ার কারণ সেই দেশে বয়স্ক লোকের সংখ্যাধিক্য, যেমন ইতালি, স্পেন, ফ্রান্স।অন্যদিকে জার্মানির জনগোষ্ঠী বয়স্ক হলেও উন্নত স্বাস্থ্যব্যবস্থা এবং জনসচেতনতার জন্যে মৃত্যুহার অনেক নীচের রয়েছে।আজ পর্যন্ত ব্যাপক সংক্রমণের হার শীত প্রধান অঞ্চল যেখানে তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রির নীচে সেখানেই পরিলক্ষিত হচ্ছে।যদিও এবিসয়ে গবেষণালব্ধ তথ্য মেলেনি, গ্রীষ্ম প্রধান এলাকায় করোনার প্রকোপ শীতপ্রধান ইউরোপ ও আমেরিকার দেশগুলোর তুলনায় কম হবে বলে সাধারণভাবে ধারণা করা হচ্ছে। আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গরা শেতালগদের তুলনায় বেশী আক্রান্ত হচ্ছেন; তবে জাতিগত পার্থক্যটি তাদের সংস্কৃতির সাথে সাথে ঘনবসতি, পরিচ্ছন্নতা এবং সার্বিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার উপর নির্ভর করে।

এখন পর্যন্ত গবেষণা ও ক্লিনিকল অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় যে সচেতনামূলক এবং প্রতিরোধ কার্যক্রমই এই মরণব্যাদি থেকে মুক্তি দিতে পারে।

প্রতিরোধ: প্রতিকারই একমাত্র উপায় (Prevention: Only way out):

এই মুহূর্তে এই কোভিড ১৯ বিস্তাররোধে জন সচেতনতা এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করাই সর্বোত্তম পন্থা। বিস্তার রোধে সবাইকে যা যা করতে হবে:

১. সামাজিক বা শারিরীক দূরত্ব বজায় রাখা – সবচেয়ে কার্যকর সহজ এবং সুলভ প্রতিরোধ ব্যবস্থা। এর আওতায় আসে:

ক) নিজ ঘরে বা বাসায় থাকা; ঘর থেকে কাজ করা সম্ভব হলে অফিসের সাথে কথা বলে তাই করা এবং অতি জরুরী প্রয়োজন ছাড়া বের না হওয়া। সম্ভব হলে অনলাইনে বাজার করা।

খ) বিনা প্রয়োজনে বাইরে বেরবেন না। অতি জরুরী প্রয়োজনে বের হতে বাধ্য হলে যেমন, জরুরী সেবার জন্য কাজে যাওয়া, বাজার করতে, ওষুধ কিনতে বা নিতে, এবং হাটতে যাওয়ার ক্ষেত্রে অন্যদের থেকে নির্দেশমত (recommended) দূরত্ব (১-২ মিটার বা ৩.২৫ – ৬.৫ ফুট) বজায় রাখা। গাড়ীতে বা টেক্সিতে বের হলে জানালার গ্লাস বন্ধ রাখা।

গ) কোন রকম জনসমাবেশ (পাবলিক, ধর্মীয় বা সামাজিক মিটিং, সম্মিলিত ইবাদত, দাওয়াত ইত্যাদি) এড়িয়ে চলুন।

ঘ) যেকোন সৌজন্যমূলক সাক্ষাত, অমনকি রোগী দেখা, হাসপাতালে যাওয়া, বিশেষ করে বয়স্ক আত্মীয়স্বজনদের সাথে সাক্ষাত পরিহার করুন। ঘরের লোকজনের সাথেও শারিরীক মেলামেশা যথাসম্ভব সীমিত রাখুন, ছোট বাচ্চাদের মুখে চুমো খাবেন না।

ঙ) গণপরিবহন এড়িয়ে চলা; সম্ভব না হলে হাচি কাশির শিষ্টাচার ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা। হাত না মেলানো। খোলা খাবার বা বাইরে কোন খাবার না থাওয়া। ব্যবহৃত কোন জিনিষ শেয়ার না করা।

২) বাইরে থেকে ঘরে ফেরার সাথে সাথে এবং নিয়মিত সাবান পানি দিয়ে ভাল করে অন্তত ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধোয়া বা এলকোহলযুক্ত স্যানিটাইজার ব্যবহার করা। বিশেষকরে বাইরে থেকে আসার সাথে সাথে তা করা। এক্ষেত্রে কুসুম গরম পানির ব্যবহার ঠান্ডা পানির চেয়ে ভাইরাস ধংসে অধিক কার্যকর।

৩) পাবলিক স্পটের কোনকিছু খোলাহাতে স্পর্শ না করা। করতে হলে হাতে গ্লাস পরা বা টিস্যু দিয়ে ধরা। ফের চোখ, নাক ও মুখে অপরিষ্কার হাত দিয়ে স্পর্শ না করা।

৪) হাঁচি বা কাশি দেওয়ার সময় টিস্যু দিয়ে মুখ ঢাকা। তেমন কিছু না পেলে হাতের ভাজকরা কনুইয়ে হাঁচি বা কাশি দেওয়া। এতে হাত ভাইরাসে দূষিত হবে না যা আমাদের অজান্তেই চোখ, নাক, মুখ বা অন্য কিছু স্পর্শ করতে পারে।

৫) মুখে মাস্ক পরলে স্বাভাবিক অবস্থায় সামান্যই সুরক্ষা পাওয়া যায়; কিন্তু উপসর্গ প্রদর্শনকারী রোগীর সংস্পর্শে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে এতে কার্যকর সুরক্ষা হয়।

৬) কাচা খাবার বা যথাযথভাবে না পাকানো খাবার এড়িয়ে চলুন। যেসব ফল কাঁচা খাওয়া যায় তা যথাযথভাবে ধুয়ে খাওয়া।

৭) ভিটামিন সি যুক্ত খাবার, সবজি ও ফলমূল বেশি খাওয়া; খাবারে ভিটামিন সি যথেষ্ট না থাকলে ভিটামিন সি ক্যাপসুল খাওয়া

৮) পরিমিত সূর্যের আলো এবং খোলা বিশুদ্ধ হাওয়া গ্রহন করা শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে চাঙা রাখতে সাহায্য করে।

৯) যথেষ্ট পরিমাণে (প্রতিদিন অন্তত ২ লিটার বা ৮ গ্লাস) পানি পান করা; অধিক চিনিযুক্ত হাল্কা পানীয়, ধূমপান ও মদ্যপান না করা

১০) অধিক রাত না জাগা এবং পরিমিত ঘুমানো

১১) লক্ষণ দেখা মাত্রই চিকিৎসা সেবা নেয়া। এজন্য যে হাসপাতাল বা ডাক্তারের চেম্বারে যেতে হবে তা না। জনস্বাস্থ্য বিভাগে (public health) বা জরুরী সেবার (emergency services) ইমার্জেন্সী নাম্বারে ফোন করুন। সেখানে দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসক আপনার কথা শুনে অবস্থামতো পরামর্শ দিবেন। মনে রাখবেন আপনার সাধারণ ঠান্ডা সর্দিজ্বর হতে পারে আর আপনি দৌড়ের হাসপাতাল বা চেম্বারে গিয়ে করোনা সংক্রমিত হয়ে আসতে পারেন। এতটুকু ঘরে বিশ্রাম নিলেই আপনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে জনগণ ভাল হয়ে যাবেন।

রোগ বিস্তার রোধের উপায়

ক) পৃথকীকরণ বা আইসোলেশন:

যদি আপনার উপসর্গ- যেমন সর্দি, কাশি, জ্বর এর কোন একটিও থাকে, তাহলে দুই সপ্তাহ বা ১৪ দিনের জন্য সম্পূর্ণভাবে ঘরে থাকুন। এতে করে আপনার থেকে অন্যদের মাঝে সংক্রমণ রোধ পাবে। ঘরে অন্যদের থেকে আপনার দূরত্ব (২মিটার বা ৬ ফুট) বজায় রাখুন। আলাদা বেসিন ও বাথরুম ব্যবহার করুন; থালাবাসন ও বিছানা আলাদা করে নিন; আলাদা

রুমে ঘুমান।কোন ঘরে এসব নিশিত করা সম্ভব না হলে, সরকারী ব্যবস্থাপনায় প্রাতিষ্ঠানিক Isolation এ চলে যান। এতে আপনার আপনজনদের সুরক্ষা হবে।এসময়ে আপনি কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠান, দোকান, বা ধর্মীয় উপাসনালয়ে যাবেন না।

যদি আপনার ছোট বাচ্চার মৃদু উপসর্গ থাকে তাকে সাবধানতার সাথে বাসায় রেখে চিকিৎসা করা এসময়ে হাসপাতালের চিকিৎসা থেকে নিরাপদ হবে। তবে হ্যাঁ কোন রকম শ্বাস কষ্টের লক্ষণ দেখা দিলে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে বা জরুরী নাস্বারে যোগাযোগ করুন।

থ) কোয়ারেন্টাইন:

আপনি যদি ভ্রমণ (বিমান, প্রমোদ ভরী, ট্রেন) থেকে আসেন বা এমন কোন লোকের সংস্পর্শ এসে থাকেন (জনসভা, মিটিং, সেমিনার যোগদান করা বা হোটেলে অবস্থানকালে) যিনি করোনা ভাইরাস রোগে আক্রান্ত ছিলেন, তাহলে নিজে সম্পূর্ণ সুস্থ্য থাকলেও দুই সপ্তাহ বা ১৪ দিনের জন্য সম্পূর্ণভাবে নিজেকে আলাদা করে রাখুন, উপরের নিয়মে ঘরে থাকুন বা সরকারী ব্যবস্থাপনায় প্রাতিষ্ঠানিক Quarantine এ চলে যান। বর্তমানে এটা করার জন্য আপনি Quarantine Act এ বাধ্য।

চিকিৎসা:

এখন পর্যন্ত এই ভাইরাসের কোন সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা বা ভেকসিন আবিষ্কৃত হয়নি। ফ্রান্সে কেবল ৩৬ মরণাপন্ন রোগী যাদের আইসিইউতে পাঠানো হয়েছিল তাদের উপর ক্লোরোকুইন (Hydroxy chloroquine) ব্যবহার করা হয়। সেটা কোন নিয়মমার্কিত রেনডমাইজড কন্ট্রোল ট্রায়াল ছিল না। কানাডা, জাপান, আমেরিকা এবং ভারতে সহ আরও কয়েকটি দেশে এন্টি ম্যালেরিয়া, এন্টিবায়োটিক (Azithromycin) ও এন্টি ভাইরাল (Remdesivir) ইত্যাদি ওষুধের উপর এরকম কয়েকটি গবেষণা চলছে।আমেরিকান Gilead Sciences এর বানানো Remdesivir ওষুধটি ইবোলার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল।২৩৭ জন রোগী নিয়ে করা একটি নিয়ন্ত্রিত হিউম্যান ট্রায়ালের (HRCT) প্রাথমিক ফলাফলে দেখা যায় যে ওষুধটি করোনার ক্ষেত্রেও অকার্যকর রয়েছে। যদিও অনেক ডাক্তারই compassionate ground এ HRCT অর ফলাফল রাওতার আগেই এ ড্রাগটি ব্যবহার করছেন, বিশ্বের সর্ববৃহৎ অক্সফোর্ড ট্রায়াল দুস্পাপ্যতার জন্য এটিকে অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি। বিশেষণের মতে সম্পূর্ণ গবেষণার ফলাফল পেতে আরো কমপক্ষে ছয় মাস সময় লাগতে পারে। করোনা রোগীদের ব্যাথানাশক NSAID যেমন ইবুপ্রফেন, ACE Inhibitors জাতীয় ওষুধের ব্যবহার ফলদায়ক প্রমাণিত হয়নি। পৃথিবীর অনেক দেশের বিজ্ঞানীরা দিনরাত এককরে কাজ করে যাচ্ছেন করোনার ওষুধ ও প্রতিষেধক আবিষ্কারের জন্য।আমরা আশা করি তারা শীঘ্রই তাদের প্রচেষ্টায় সফল হবেনই। তাই নিশ্চিত কিছু জানার আগে কোন ওষুধের উল্লেখ করা হলো না। চিকিৎসা এখন পর্যন্ত উপসর্গিক (symptomatic)-রোগীকে আলাদা পরিষ্কার হাওয়া বাতাসযুক্ত রুমে

রাখতে হবে, শরীরের পানীয় নিশ্চিত করতে হবে, রক্তের চাপ, অক্সিজেন লেভেল, ফুসফুসের তরলের পরিমাণ দেখতে হবে। স্বর হলে পরিমানমত স্বরের ওষুধ (paracetamol) দেয়া যেতে পারে যেন লিভারে অধিক চাপ না পড়ে।

এক্ষেত্রে ঘরোয়া চিকিৎসার মধ্যে অধিক (৭-১০ ঘন্টা) বিশ্রাম গ্রহন, স্বাস্থ্যসম্মত খাবার, প্রচুর বিশুদ্ধ পানীয় পান (২০ মিনিট পর পর কয়েক চুমুক কুসুম গরম পানি পান করা); ভিটামিন সি যুক্ত টাটকা ফলমূল খাওয়া; আদা-চা, লেবু-মধু সহ কুসুম গরম পানীয়, হলুদ, রসুন, কালোজিরাসহ অন্যান্য ভেসজ যেগুলো সাধারণ ভাইরাসের ক্ষেত্রে কার্যকর সেগুলোর কার্যকারীতা করোনা ভাইরাস রোগের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রমাণিত।

আরোগ্য সম্ভাবনা:

আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে শতকরা ৮০-৯৫ ভাগ রোগীর উপসর্গ মৃদু যদিও তাদের শারিরীক অবস্থা সাধারণ ঠান্ডা বা আমাদের পরিচিত ইনফ্লুয়েঞ্জা থেকে মারাত্মক। এসব রোগী কোন প্রাতিষ্ঠানিক চিকিৎসা ছাড়া অথবা সাধারণ ঘরোয়া চিকিৎসায় দুই সপ্তাহের মধ্যে ভালো হয়ে যায়। ৫-২০% ভাগ রোগীর এক সপ্তাহের মধ্যে শ্বাসকষ্ট শুরু হতে পারে যাদের হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা নিতে হয়। ভর্তি রোগীদের ৩-১০% এর তীব্র শ্বাসকষ্ট (ARDS) হয় এবং তাদের আইসিইউ (ICU) সাপোর্টের প্রয়োজন হয় যেখানে প্রয়োজনে অক্সিজেন ও ভেন্টিলেটর সাপোর্ট দিতে হয়। মারাত্মক রোগীরা ৩-৬ সপ্তাহ পর্যন্ত অসুস্থ থাকতে পারেন। এর মধ্যে শ্বাসকষ্টের উন্নতি না হলে অবস্থা অনুসারে যে কোন সময় রোগী মারা যেতে পারে। মোটের উপর ২-৭% পর্যন্ত লোকের মৃত্যু ঘটে, তবে তা অধিক বয়সী ও পূর্বে যারা কোন জটিল রোগে ভোগেছিলেন তাদের ক্ষেত্রে অধিক (২০% বা তার বেশী)।

স্বাভাবিক ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রতিরোধ:

সুখবর হলো, যে কোন ভাইরাসের মতো করোনা ভাইরাসও একবার মানবদেহকে আক্রান্ত করলে দেহে একটি প্রতিরোধ ব্যবস্থা (Immune system) গড়ে উঠে। ফলে পরবর্তী আক্রমণে এই ভাইরাস শরীরের প্রতিরোধ ব্যবস্থায় কাবু হয়ে পড়ে এবং কোনো ক্ষতি করতে পারে না। মনে রাখা প্রয়োজন যে, করোনা ভাইরাস হয়তো ইতোমধ্যে আমাদের অনেকের দেহেই প্রবেশ করেছে, কিন্তু শক্তিশালী ইমিউন সিস্টেমের জন্য সামান্য কাশি বা সর্দি ছাড়া তেমন কোন লক্ষণ সৃষ্টি করেনি এর ফলে আমরা টেরও পাননি। ফলশ্রুতিতে এসব ভাগ্যবান ব্যক্তির বিনা যুদ্ধেই করোনার বিরুদ্ধে জয়ী হয়েছেন। কোন দেশে বা সমাজে যদি ৪০% এর বেশী লোকের মধ্যে এরকম স্বাভাবিক সামাজিক প্রতিরোধ (Herd Immunity) গড়ে উঠে তাহলে সেখানে সংক্রমণ রোধ হতে পারে। যেমন ২০১০-১১ সালে নরওয়েতে এরকম সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে উঠার জন্য সেখানে Swine flu এর প্রত্যেক তত বেশী দেখা যায়নি। এটি রোগ বিশেষে ৮০-৯৫% হতে হয়। তাই করোনার ক্ষেত্রে এ সামাজিক প্রতিরোধ ঠিক কত ভাগ লোকের মধ্যে রোগ প্রতিরোধ গড়ে উঠলে সম্ভব তা এখনও গবেষণার বিষয়।

টিকা বা ভ্যাকসিন:

এক্ষেত্রে আশার কথা হলে এইডসের ভাইরাস সনাক্ত করতে যেখানে প্রায় দুই বছর লেগেছিলো, সেখানে মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যেই এই নভেল করোনা ভাইরাসটি সনাক্ত হয়ে যায় এবং ইতোমধ্যেই এর জিনের গঠন (genomic structure) জানা হয়ে গেছে। এর মিউটেশন রেট খুব বেশি না। ভাইরাসের জিনোমে, অরিজিন সম্পর্কে জানার পর এখন আমরা ভাইরাসটি কিভাবে ডিটেক্ট করতে হয়- তাও জানা গেছে। গবেষকরা তিন ধরনের প্রতিষেধক টিকা নিয়ে কাজ করছেন: ১) Spike protein vaccine 2) RNA vaccine এবং ৩) পুরো করোনা ভাইরাসটির ভ্যাক্সিন। প্রথম দুটি ভাইরাসের এক এক অংশের এবং তৃতীয়টি পুরো ভাইরাসটির বিরুদ্ধে কাজ করবে। যেখানে তৃতীয় ভ্যাক্সিনটি ব্যর্থ হলে ভাইরাসটি পুনর্জীবিত হয়ে রোগাক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকবে সেখানে ভাইরাসের অংশবিশেষ দিয়ে বানানো ভ্যাক্সিনটির ক্ষেত্রে এ ঝুঁকি থাকবে না। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির জেনার ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা প্রফেসর সারা গিলবার্ট (Sarah Gilbert) এর নেতৃত্বে একটি পরীক্ষামূলক ভ্যাকসিন (ChAdOx 1 n CoV -19) তৈরী করেন। তারা শিম্পাঞ্জি থেকে পাওয়া এক বিশেষ ধরনের এডেনোভাইরাসের (adenovirus) জীকে পরিবর্তন করে এই নতুন ভ্যাকসিনটি বানিয়েছেন। খুব দ্রুত প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ভ্যাকসিনটিকে তারা ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন। যার ফলে চার বছরের কাজ চার মাসেই সম্পন্ন হয়েছে। সর্বশেষ ২৩ এপ্রিল ২০২০ তারিখে দুজন মানুষের দেহে পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ এ টিকা প্রয়োগ করা হয়েছে যদিও এজন্য ৮০০ জন স্বৈচ্ছাসেবকে নির্বাচন করা হয়েছে। এ পরীক্ষা সফল হলে ভ্যাকসিনটি বাণিজ্যিক উৎপাদনের মাধ্যমে আগামী সেপ্টেম্বর ২০২০ মাসের মধ্যেই এর মিলিয়ন ডোজ উৎপাদন করে মানুষকে দেওয়া হবে। সবকিছু ঠিকঠাক মতো চললে বছরের শেষ নাগাদ ভ্যাকসিনটির এক বিলিয়ন ডোজ তৈরি হয়ে যাবে বলে আশা প্রকাশ করা হচ্ছে। বিশ্ব আহমদীয়া জামাতের ৫ম খলীফা (আই) তাঁর ২৪ এপ্রিলের জুম'আর খোতবায় করোনার টিকার উপর গবেষণাকারী বিজ্ঞানীদের সফলতার জন্য সবাইকে দোয়া করার আহবান করেছেন।

করোনা যুগে মানসিকভাবে ভালো থাকা:

করোনা প্রতিরোধে সাবধান হওয়া জরুরী, শংকিত হলে বিপদ না কমে বাড়তে পারে মানসিক বিপর্যস্ততা। তাই শুধু করোনার নেতিবাচক দিকগুলো না দেখে, ইতিবাচক বিষয়গুলো থেকে উপকৃত হতে হবে। পরিবার পরিজন বিশেষ করে বাচ্চাদের সাথে মূল্যবান সময় গঠনমূলক কাজে ব্যয় করতে হবে। ঘরোয়া খেলা, সৃজনশীল প্রকল্প, জরুরী জীবন ঘনিষ্ঠ দক্ষতা অর্জন- রান্না করা, বই পড়া ও ডাইরী লিখা, বাগান করা, ছবি আঁকা, মেডিটেশন করা, ইবাদতে মনোযোগী হওয়া ইত্যাদির মাধ্যমে এই লকডাউনের সময়টাকে মূল্যবান করে তুলে যায়। প্রতিদিন ছোটদের অন্তত এক ঘন্টা ও বড়দের ৩০ মিনিট ঘরোয়া খেলাধুলা, ব্যায়াম, বা যে কোন শারিরীক কসরত করা জরুরী। এতে মানসিক চাপ কমবে। অবশ্যই ধূমপান বা কোন নেশাবস্তু গ্রহন মানসিক চাপ কমাবে না বরং এগুলো আত্মহত্যার সামিল বলে প্রমাণিত।

মনে রাখবেন অসুস্থ হওয়া কোন অপরাধ নয়। আপনি সবরকম চেষ্টা প্রচেষ্টার পরও অসুস্থ হয়ে পড়লে, আপনার ডাক্তার বা পাবলিক হেলথ হটলাইনে ফোন করুন; পরামর্শ নিন এবং সেগুলো মেনে চলুন। বেশীর ভাগ লোক (৮০% এর বেশী) করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জয়ী হচ্ছেন, আপনিও পারবেন। মানসিকভাবে বিপর্যস্তবোধ করলে মানসিক সাপোর্ট সেন্টার ফোন করুন, পরামর্শ নিন ও তা মেনে চলুন। তারা আপনার পরিচয় গোপন রাখবে।

এই ডিজিটাল যুগে আত্মীয়-স্বজনদের সাথে ভিডিও-অডিও ফোনে কথা, সাক্ষাত ও কুশল বিনিময় করা, আত্মীয়-অনাত্মীয় পাড়া-প্রতিবেশীদের যাদের কোন সাহায্যের দরকার তা নিয়ে এগিয়ে আসার মাধ্যমে মানবিকতার চর্চা করা এবং তার মাধ্যমে মানবিক মূল্যবোধকে এগিয়ে নেয়ার মাধ্যমে হৃদয়-মনের প্রশান্তি অর্জন করা যায়। এতে করে মানসিক ও আধ্যাত্মিক সুস্থাস্থ্যও বজায় থাকবে। মনে রাখতে হবে যে, পৃথিবীতে কোনো সংকটই চিরস্থায়ী নয়; জীবনে চড়াই-উৎরাই আছে; সুসময় ও দুঃসময় পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হয় এবং সংকটের পর আসা সুসময়টি সর্বদাই বেশী উপভোগ্য হয়। সবশেষে সবার পরিপূর্ণ সুস্থ্যতা ও নিরাপদ জীবন কামনা করছি।

লেখক: ড. সেলিম মুহাম্মদ খান, এমবিবিএস, এমপিএইচ, পিএইচডি; পোস্টডক্টরাল রিসার্চ ফেলো, ক্যালগ্যারী ইউনিভার্সিটি, কানাডা। সাবেক হেড অব সাব-অফিস, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, সুদান।

Websites: PubMed, ORCID, Academia, ResearchGate

সূত্র: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, হেলথ কানাডা, CDC এবং জন হপকিনস্ ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইট এবং কিছু গবেষণাপত্র থেকে।